



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 627 - 636

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

কৃষ্ণা বসুর কবিতা : ‘রক্তাক্ত হৃদয়ের গান’

সুপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়

গবেষক, বাংলা বিভাগ

সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

Email ID: supriyoganguly26@gmail.com

ID 0009-0004-4995-155X

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Feminism,
Gray Years,
Patriarchy,
Protest,
Woman
liberation,
Loud Voice,
Marriage,
Rape,
Socialism,
Poverty.

Abstract

Krishna Basu is one of the great poets of Bengali literature. She was born in Chandannagar (Hooghly district), in 1947. She was a Professor by profession. Her first ‘Book of Poetry’ ‘Shabder Sharir’, was published by ‘National Publishers’ in 1976. Then the Poetry books that were published one by one; Important among which are: ‘Jaler Saarolye’, ‘Jal Batase andhokare’, ‘Samasta meyeder hoye’, ‘Parijayi Pakhider dana’. But ‘Raktakto Hridayer Gaan’ is one of the best ‘Poetry books’ she has written.

Krishna Basu has managed to convey a strong protest in a simple tone in Bengali poetry. The dimensions and signs of women’s oppression that were still present in the seventies began to be shown again. What Poet Kabita Singha had shown, Krishna continued to show more fully, strongly and clearly. With protest, Krishna Basu wanted to find a woman’s own world, her own individuality. Her poetry is also mainly associated with ‘feminist Ideology’. In a simple tone, the poet spoke out against the daily disrespect that women face, from the home to the workplace. The Poet repeatedly tried to break the ‘Stereotype of Masculinity’ in her Poetry.

In the poem, Krishna Basu talks about the overthrow of Patriarchy, which reaches people from all walks of life. Her poetry, which is a blend of compassion and intense sensitivity, makes the reader responsible. The reader becomes aware, the reader becomes protesting. Her poems deal with issues of motherhood, marital rape, and all kinds of humiliations against women. Krishna Basu’s poetry is also notable for its use of myth, which he recreates in his poetry. Literary women of the past, such as ‘Manasa’, ‘Sita’, ‘Behula’, ‘Radhika’ and ‘Draupadi’, have found a permanent place in her writings. Although She is aware of Nature and the Environment, the focus of her writing is primarily on People, Human Society, and Human Relationships. Humanism is the main element of her Poetry. Krishna Basu is a sensitive Poet who made her poetry a captivating narrative of women’s struggles.

Discussion

এক

ঋগ্বেদ যে কবিকে আমাদের সামনে আনে তিনি ছিলেন একজন অন্ধাধি। আর মহাভারতে যে কবির হৃদিশ মেলে তাঁর জন্ম ব্রহ্মার যজ্ঞের আগুন থেকে। কবির যেমন অন্ধ হলেও দূরদর্শিতা থেকে বঞ্চিত হন না, বরং হয়ে ওঠেন অবিসংবাদিত সত্যদ্রষ্টা, ঠিক তেমনই কবির জন্ম আগুনে হলেও তিনি দাউ-দাউ করা আগুনের আঁচকে হৃদয়ে নিয়ে আঁচড় কাটতে পারেন কবিতার শরীরে। আগুনে পুড়তে পুড়তেও লিখে যেতে পারেন রক্ত-মাংস, মন-আত্মার দহনগাথা; লিখে যেতে পারেন যন্ত্রণাদাক্ষ্য পোড়া ছাইয়ের কথা; লিখে যেতে পারেন চূড়ান্ত জীবনসত্য। কৃষ্ণ বসু (১৯৪৭ খ্রি.) বাংলা কবিতার এমনই জীবন্ত কিংবদন্তি, এমনই আশ্চর্য সত্যদর্শী কবি। যিনি দেখিয়েছেন রাজপথের নারকীয় বাস্তবকে, চাঁদডোবা মেঠোগাঁয়ের পৈশাচিক সত্যকে। একটা ‘অমানিশা-অন্ধকার দেশ’ নিজের সন্তানদের দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে। বাইরের শত্রু রূপান্তরিত হয় অন্তরের শত্রুতে, যারা হুঁদরের বেশে ‘দেশ’ নামের রুটিকে টুকরো টুকরো করে কাটতে শুরু করে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ সেই সময়পর্ব, যে সময়ে রক্ষক হয়ে ওঠে ভক্ষক। সেই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দেই জন্ম নেন কবি কৃষ্ণ বসু, ১৭ই নভেম্বর ছিল দিনটি।

স্বাধীনতা পর্ববর্তী সময়পর্বে দেশভাগ-দাঙ্গার দগদগে ক্ষত বয়ে বেড়ানো মানুষের মাঝে কবি কৃষ্ণ বসুর শৈশব অতিবাহিত হয়। মধ্যবিভক্ত স্বপ্নদেখা ও স্বপ্নভঙ্গের সাথে গ্রাম ও পরিবারের ভাঙন পঞ্চাশের জনমেজাজকে করে তোলে অন্তর্মুখী। তারই মাঝে কাটে কবির শৈশব। কবির বেড়ে ওঠা ছয়ের দশকে; যে দশক ভারত-চীন যুদ্ধ (১৯৬২ খ্রি.) থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভাজন (১৯৬৪ খ্রি.), ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ (১৯৬৫ খ্রি.) থেকে নকশালবাড়ি আন্দোলন (১৯৬৭ খ্রি.) এর সাক্ষ্য দেয়। যে অস্থির দশক ক্ষোভের কথা বলে, ক্ষুধার কথা বলে সেই দশকই কবির যৌবনকাল। আর সত্তর দশক শুরু হচ্ছে নকশালবাড়ি আন্দোলনের উত্তাল রেশকে সাথে নিয়ে। পাশাপাশি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মর্যাদা প্রাপ্তি, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে জনমানসের তীব্র অসন্তোষ, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে রেল ধর্মঘট, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের জরুরী অবস্থার সূচনা, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় বামফ্রন্টের সরকার গঠন, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে কদর্য মারিচকাপি কাণ্ড প্রভৃতি একের পর এক ঘটনাপ্রবাহ গোটা দশককে উত্তপ্ত করে তোলে। তাই সত্তর দশকে এসে, -

“পঞ্চাশে ও ষাটে রচিত কবিতায় আত্মরতির গোলকধাঁধা প্রসারিত হল ক্রমাগত। তারুণ্যের প্রাথমিক উন্মাদনায় যাঁরা কবিতায় প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় অনুপঞ্জকে প্রত্যাখ্যান ও বিদ্রূপ করে নিজস্ব শিল্পভাষা নির্মাণ করেছিলেন, তাঁরাই একে একে প্রাতিষ্ঠানিক চক্রব্যূহে প্রবেশ করলেন। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রতিষ্ঠার মোহ বড়ো হয়ে উঠলো, কেন না ইতিমধ্যে বাঙালি সমাজের কোষে-কোষে বিকার ও বিদূষণ সংক্রামিত হয়ে গেছে। দেশভাগ-পরবর্তী খণ্ডিত ভারতে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে গোপন ও প্রকাশ্য সমঝোতা করে পুঁজিবাদ হয়ে উঠেছে রাষ্ট্র ব্যবস্থার চূড়ান্ত নিয়ামক।”^১

এই কালপর্বে কবিতা লিখছেন জয় গোস্বামী, মৃদুল দাশগুপ্ত, একরাম আলী, অমিতাভ গুপ্ত, রনজিৎ দাশ, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল প্রমুখরা। সত্তরে লিখলেন কৃষ্ণ বসুও, স্বতন্ত্র সুরে। লিখলেন নারীর ক্ষমতায়নের বিপক্ষে থাকা সমস্ত অপশক্তির বিরুদ্ধে। লিখলেন রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের কথা, লিখলেন দগদগে ঘা ও ক্ষতের কথা।

কৃষ্ণ বসুর লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘শব্দের শরীর’, যেটি প্রকাশিত হয় ন্যাশনাল পাবলিশার্স প্রকাশনী থেকে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে। এর পরবর্তী সময়ে কবির লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল— ‘জলের সারল্যে’ (মহাপৃথিবী, ১৯৮২ খ্রি.), ‘কার্ডিগানে কুসুম প্রস্তাব’ (প্রমা প্রকাশনী, ১৯৮৬ খ্রি.), ‘অন্যমনস্ক বাতাস ও খোলাপাতা’ (আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯২ খ্রি.), ‘হস্তারক প্রিয় সখা’ (আবর্ত প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রি.), ‘সাহসিনী কে রয়েছে সাজো’ (আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯ খ্রি.), ‘ও গান যাও, নাও ভাসাও’ (সুতনু প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.), ‘সমস্ত মেয়েদের হয়ে....’ (সুতনু প্রকাশনী, ২০০৭), ‘কবিতাই শীর্ষ শিল্প’ (সাংস্কৃতিক খবর (সই প্রকাশনী, ২০১০ খ্রি.), ‘পরিয়াদী পাখীদের ডানা’ (সাংস্কৃতিক খবর, ২০১১ খ্রি.), ‘মধ্যরাতে চন্দ্র প্রপাত’ (চারুকাক, ২০১২ খ্রি.)। এছাড়াও কবির লেখা উপন্যাস ‘দুই নারী দুই জীবন’ (দে পাবলিকেশন, ২০১১ খ্রি.)। লিখেছেন প্রবন্ধগ্রন্থও।

সপ্তর্ষি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত ‘হায়, সভ্যতা!’ (২০০৯ খ্রি.) এবং অপর একটি গ্রন্থ ‘নারীহন্তা সুসভ্যতা’ যেটি প্রকাশিত ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে মুক্ত চিন্তা প্রকাশনী থেকে। প্রকাশিত হয়েছে শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলনও। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে যেটি প্রকাশ করেছেন দে’জ পাবলিশার্স। ‘কবিতা সংগ্রহ’ সপ্তর্ষি প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে ‘কৃষ্ণা বসুর কবিতা সমগ্র ৩’ এবং ‘কৃষ্ণা বসুর কবিতা সমগ্র ৪’।

দুই

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নারী আপন আধিকার প্রাপ্তির লড়াইয়ের রেশ কমেছিল এই ভেবেই, যে রাষ্ট্রনৈতিক থেকে সমাজতান্ত্রিক পরিকাঠামো সর্বত্রই নারীর প্রত্যাশা ছিল একটা বড় পরিবর্তনের। সময় নিয়েছিল তাঁরা এবং প্রত্যাশা ছিল সামগ্রিক অগ্রগতির। অগ্রগতির প্রত্যাশা ছিল—

১. রাষ্ট্রনীতির প্রতি,
২. সমাজতন্ত্রের প্রতি,
৩. পিতৃতান্ত্রিক পরিবারতন্ত্রের প্রতি।

সুতরাং কবিতা সিংহের লড়াইয়ের রেশ পরবর্তী দশকের কবিদের আরও কয়েক কদম এগিয়েই ভাবতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু বাস্তবটা ছিল অন্য। প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির ফারাক ছিল বিস্তার। নারীরা সাতের দশকে এসে খেয়াল করে নারীর অবরোধের যে মাত্রা তা একটুও কমেনি স্বাধীন দেশের কুড়ি বছর পরে এসেও। একটুও বদলায়নি নারীর বিপক্ষে চিরকাল বহমান পিতৃতন্ত্রের সুলভ চক্রান্ত। ফলত, সাতের দশকে ভারতবর্ষের বুকে নতুন করে দানা বাঁধে নারীবাদী ভাবনার। নারী আন্দোলনের নতুন পর্যায় শুরু হয়। নারীর অবরোধের যে যে মাত্রা ও চিহ্নগুলি সাতের দশকে এসেও বর্তমান তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়। পূর্বে যা দেখিয়েছিলেন কবিতা সিংহ, তা যেন আরও পূর্ণাঙ্গ, জোরালো ও স্পষ্ট করে দেখাতে থাকেন কৃষ্ণা বসুরা। পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে জেহাদ কবিতা সিংহ কবিতায় ঘোষণা করেছিলেন, তা যেন সাতের দশকের কৃষ্ণা বসুর কলমে আরও সহজ সুরে ব্যক্ত হতে থাকে। সাতের দশকের নারীকণ্ঠের মেজাজে যুক্ত হয় অভিমান; এত লড়াইয়েও না পাওয়ার অভিমান; প্রত্যাশা পূর্ণ না হওয়ার অভিমান। অভিমান সেই পুরুষতন্ত্রের প্রতি— যে তন্ত্র ভুলে যায় গোটা উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে নারী নিজেকে প্রমাণ করে এসেছে, প্রমাণ দিয়ে এসেছে সমকক্ষতার। কৃষ্ণা বসু যেন গোড়া থেকে আঘাত হানতে শুরু করলেন। এমন একটা সুরে নারীবাদী আখ্যানকে কবিতায় বুনলেন যা পূর্বে কেউ বোনেনি। খুব সহজ সুরে, সহজ অথচ গভীর ভাষায় তিনি লিখলেন সেই কথা, যে কথা সমাজের প্রতিটা শ্রেণীর মানুষের বিবেকে এসে ঘা মারে। জাগরণকে তিনি আনার চেষ্টা করলেন সর্বস্তরের নারীদের কথা ভেবে। ‘কর্মজীবী নারীর প্রতি হওয়া নিপীড়ন’ আর ‘গৃহস্থ নারীর প্রতি হওয়া নিপীড়ন’ যে পৃথক, তা বুঝে নিয়েই তিনি কবিতা লিখলেন সমাজের সর্বস্তরের নারীদের জন্য। দরিদ্র বা নিম্নবর্ণের নারীর জন্য যে স্বাধীনতা দরকার কবিতায় তার বয়ান, আবার উচ্চবৃত্ত অথচ নিপীড়িত যে নারী তার জন্য যে মুক্তির দরকার তার কথনকে পৃথকীকরণ করলেন তাঁর কবিতায়। এই পৃথকীকরণ পূর্ববর্তী নারীকণ্ঠে দেখা যায়নি।

কৃষ্ণা বসু প্রথম থেকেই তাঁর কবিতায় নারীমুক্তির কথা, নিজস্ব অধিকারকে ছিনিয়ে নেওয়ার কথা প্রযুক্ত করেন। তাঁর কবিতায় প্রতিবাদের যে ধারা লক্ষ্য করা যায় সেখানে প্রথম থেকেই তার মধ্যে ‘ব্যঙ্গনার পর্দা’ কম, বরং ‘পর্দা’ ছিঁড়ে ‘আঁধার’কে দেখানোই বেশি করে পরিলক্ষিত হয়। আলোচনায় আনা যেতে পারে ‘প্রিয় পুরুষ প্রজাতি’ কবিতাটি। কবি লিখলেন—

“নারীর গর্ভে জন্ম নিয়ে নারীকে দাও হেলা,
সঙ্গিনীকে খর্ব করো এই বেলা ওই বেলা।

... ..

‘দেবী’ বলেই স্তুতি করো, দাসীর অধম জানো,
বশ করবে বলে মধুর বেঁধেছ ঢের গানও।”^২

পুরুষ হোক বা নারী জন্ম নেয়, বেড়ে ওঠে নারীর গর্ভে, নারীর কোলে। ‘মাতৃত্ব’ সেই ক্ষেত্র যা জীবনকে ধারণ করে, লালন-পালন করে। অথচ নারীকেই থাকতে হয় অবহেলার অতলে। নিজের জীবন সঙ্গী থেকে মা কিংবা নিজের বোন থেকে বয়স্ক ঠাকুমা কেউই বাদ পড়ে না এই অবজ্ঞার পীড়ন থেকে। নির্যাতিত হওয়াই যেন নারীর ভবিতব্য। তবে এখানে কোনো এক পুরুষের প্রতি কবি দ্রোহের প্রকাশ করেননি। করেছেন পুরুষ প্রজাতির প্রতি। পুরুষপ্রজাতি বাহুবলে, শুধুমাত্র ক্ষমতার আধিপত্যে আত্মজাহির করে, চালকের আসনে বসে। এই ধারণাকেই ভাঙতে চাইছেন কবি। নারীর ক্ষমতায়ন যে চাইছেন কবি তা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন কবিতায়। ‘দাসী’র চোখে দেখে, নারীকে দাসত্বের মুড়ে ‘দেবী’ বলে স্তুতি করার মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক ভণ্ডামি লুকিয়ে আছে, তা স্পষ্ট করেন কবি। প্রতিবাদে সোচ্চার হন। বিরুদ্ধাচারণ করলেন এই পন্থার। কিন্তু কোন ভঙ্গিতে করলেন এই বিরুদ্ধাচারণ? কবিকণ্ঠ এখানে সোচ্চার হয় পিতৃতন্ত্রের চিরায়ত নিপীড়নগুলোকে তুলে ধরার জন্য। কবির স্পষ্ট ঘোষণা— ‘সভ্যতাকে সাজিয়ে তোলা মিথ্যা এবং স্তোকে।’ মিথ্যার হাঁটে গাঁথা পিতৃতান্ত্রিক সাম্রাজ্যকে কবি ভেঙে দিতে চান তাঁর কলমের বলে। এই প্রতিবাদের ভাষ্য প্রতিটা শোষিত, লাঞ্চিত মানুষকে জাগিয়ে তোলে। দৃঢ়, ঋজু করে তোলে। এই ভঙ্গি কৃষ্ণ বসুর একান্ত নিজের, যেখানে প্রতিবাদের ভাষ্য প্রয়োগে নেই কোন কৃত্রিমতা, নেই যুক্তিহীনতা। একটা নিটোল চাক্ষুষকেই কবি ভাষ্য করে তোলেন কবিতার। তাই তো বলেন অনায়াসে—

“ফুলে ফুলেই ঘুরে বেড়াও পুরুষ প্রজাপতি,/ আজ এ ফুলে কাল ও ফুলে দুরন্ত সম্মতি!”^৩

নিঃসঙ্কোচ প্রতিবাদের কথা বুনে কবিতা লিখলেন কবি কৃষ্ণ বসু। সবশেষে ভালোবাসার কথা বলে কবিতাটিকে এক অন্যমাত্রা দিয়ে দেন। বলেন—

“শোধান নেই, শীলন নেই, তবুও ভালোবাসি!”^৪

একদিকে জানালেন পিতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামোর বিনাশ নেই আজও, গোত্র থেকে গোত্রান্তরে তা নানারূপে ছড়িয়ে চলেছে। অপরদিকে জানালেন তবুও ভালোবাসি, পুরুষকেই, নারীমন তবুও ভালোবাসে পুরুষকেই। খেয়াল করার বিষয় বিস্ময়সূচক চিহ্নযোগে কবিতাটি শেষ করলেন। বিস্মিত হলেন ভালোবাসার অমোঘ ক্ষমতা নারীর মধ্যে থাকার জন্য। যে ভালোবাসা প্রদানেই তারা ‘প্রকৃত বিজয়ী’। কারণ, ভালোবাসা মারাত্মক সংক্রামক কবিত্বটিতে, যা মঙ্গলসাধন করে চলেছে নর-নারীর যাপন ক্ষেত্রে।

‘ভালোবাসা’ একদিকে কবিত্বটিতে বিজয়ী মন্ত্র। কিন্তু অন্যদিকে আবার এই ‘ভালোবাসার মোহ’ই নারীকে বদ্ধ করে। কৃষ্ণের মোহন বাঁশির মোহে প্রেমিকা রাধা আকুল হয়ে ওঠে, নারী সমস্ত পূর্বক্ষতের দাগ মুছে সাড়া দেয় বারবার ভালোবাসার আশ্রানে। ভালোবাসার ছলে ভুলে যায় সমস্ত লাঞ্ছনা। কবি এই প্রথাকে বলেছেন ‘জন্ম হওয়া’—

“কৃষ্ণ তোর বাঁশি কোথায়? যমুনাতীর কই?/ মরণটানে বাঁশির সুরে দারুণ জন্ম রই!”^৫

কৃষ্ণের মোহনবাঁশি পুরুষতন্ত্রের জালের মতো, যা বারবার আবদ্ধ করে রাখে নারীকে। কিন্তু এই আবদ্ধতা থেকে নারীর মুক্তির প্রয়োজন। প্রয়োজন অস্বীকারের। প্রয়োজন মিটলে দূরে ঠেলে দেওয়ার অভ্যাসের যে সংক্রমণ তার থেকেও মুক্তি প্রয়োজন। কবি তাই বলেছেন— ‘সর্বক্ষণ পেরিয়ে যেতে চেয়েছি এই অপমান বন্ধন গ্রন্থি থেকে’। কৃষ্ণ বসু যে বন্ধন গ্রন্থি থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলেন তা পিতৃতন্ত্রের বন্ধনগ্রন্থি। এর থেকে মুক্তি চাইলেন কবি। মুক্ত করতে চাইলেন সেই সব নারীদের, যারা এই বন্ধনে বারবার আবদ্ধ হয়, আর বারবার ঠেকে। তাই জানালেন তাদের—

“বিবাহ-মন্ত্রের জাদু ফিকে হয়ে আসে।

চন্দনের গন্ধ স্নান, বাসি ফুল-মালা।”^৬

বিবাহের নবপ্রমে ডুবে থাকা নয়, দরকার আত্মনির্ভরতার। আত্মনির্ভর না হলে নিজের জীবনচর্যা রূপান্তরিত হবে বাসিফুলের ন্যায়। ভেতরের জ্বালা-ক্ষতকে তখন ঢাকতে হবে বিবাহের শাড়িতে। তাই নারীশক্তির জাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন কবি।

তিন

কৃষ্ণ বসুর কবিতা যেখানে পূর্ববর্তী দশকের নারীকবিদের থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছে সেটি হল— নারীর অবরোধের জন্য যে যে উপাদান কার্যকরী ভূমিকা পালন করে তার ফাঁদ কাটার কৌশল এবং উপায় কবি বলে দেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। আজও

নারী বাঁচে পতির পরিচয়ে। নারীর পদবী পরিবর্তনের ঘটনা শুধু নয়, নারীর নিজস্ব পরিচয় ও জগৎ সৃষ্টি করার অনিচ্ছার মূলে যে পিতৃতন্ত্র নির্মিত সমাজতান্ত্রিক পরিকাঠামো বিরাজমান, তা বারবার কবিতায় তুলে ধরতে চেয়েছেন কবি। একথা ঠিক এই উচ্চারণ কবিতা সিংহের হাত ধরে শুরু হয়েছিল। কিন্তু কবি কৃষ্ণা বসু দুই দশক পরবর্তী সময়ের কবি। তিনি পাঠ করছেন নারীবাদী তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ দলিলগুলি। ফলত, পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনার যে ভিন্নমাত্রিক দিক তা আরও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠছে কৃষ্ণা বসুর হাত ধরে। যেমন, ‘পরিয়াদী পাখিদের ডানা’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘মেয়েদের জীবনের গান’ কবিতায় কবির ঘোষণা—

“নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাও? নিজের ভূমি গড়ো,
সামন্ত এই পিতৃতন্ত্রে নিজের লড়াই লড়ো!
পিতা, পতির পরিচয়ে বাঁচবে কেন মেয়ে?
বহির্বিশ্ব অবাক হয়ে তোমার দিকে চেয়ে।”^৭

নারীর নিজের পায়ের দাঁড়ানোর কথা কবিতা সিংহরা শুধু কবিতার মধ্যে দিয়ে নয়, নিজের জীবন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। নবনীতা দেবসেন কিংবা কৃষ্ণা বসু নিজেও স্বাবলম্বী ছিলেন এবং মনে করতেন নারীর আর্থিক স্বাবলম্বন না এলে অবরোধ কখনও মোচন হবে না। পাশাপাশি কৃষ্ণা বসু যে দশকের কবি, সেই সাতের দশক, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ দশক যেখানে নারী নতুনভাবে পুনরায় জেগে উঠছেন। কারণ— একথা প্রচলিত যে উনিশ শতকের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে নারীর বৈপ্লবিক আন্দোলনে পুরুষের সহযোগী হয়ে ওঠার নিরিখে যে বহুমুখী জাগরণ তা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে থাকে। পাঁচ এবং ছয়, এই দুই দশকে সেভাবে নারীবাদী আন্দোলনের রেশ দেখা যায় না যতটা প্রত্যাশা ছিল। জানা যায়—

“নতুন জাতি সত্তা অর্জন তথা স্বাধীনতা লাভের উচ্ছ্বাসের কারণে স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টি অনেকটাই গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। গবেষিকা অপর্ণা মহাতো তাই নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের এই পর্যায়কে ‘ধূসর বছরসমূহ’ বা ‘Gray Years’ বলে চিহ্নিত করেছেন।”^৮

কিন্তু এই ‘Gray Years’ কেটে যায় সাতের দশক থেকে — “ধূসর বছর সমূহকে” অতিক্রম করে ১৯৭০-এর দশকে ভারতের নারী আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠতে থাকে। এই সময়ে লিঙ্গ সচেতনতা ও লিঙ্গ সাম্যের দাবীতেই ভারতের লিঙ্গ রাজনীতি ও লিঙ্গ সাম্যের আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। এবং এই আন্দোলনের পিছনে বেশ কিছু বিষয় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। এই বিষয়গুলি হল যথা— ১৯৭০ এর দশকে লোক নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, পৌর অধিকারের অনুকূলে জরুরী অবস্থার (১৯৭৫) পরবর্তী পর্যায়ে উদ্দীপিত গণ-আন্দোলন, Committee on the Status of Woman in India বা ভারতের নারীর অবস্থান বিষয় কমিটির রিপোর্ট, যেটি নারীর উপর বৈষম্যমূলক আচরণের বিষয়টিকে তুলে ধরেছিল এবং মথুরা ধর্ষণ মামলা (১৯৭২), যেটি নারীর মর্যাদার সামাজিক বিষয়টিকে রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত করেছিল।”^৯

তাই কৃষ্ণা বসুর কবিতায় নারীর নিজস্ব জগৎ নির্মাণের অন্তর্ভুক্ত স্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই কবি বলতে বলতে চান —

“সর্বক্ষণ পেরিয়ে যেতে চেয়েছি এই অপমান বন্ধন গ্রন্থি থেকে।”^{১০}

কৃষ্ণা বসুর কবিতার প্রতিস্পর্শী রূপ বড় বেশি তীব্র যখন কবি হয়ে উঠছেন এই নিগূহীত নারীর প্রতিনিধি। স্বাধীনতার প্রাক্কালে কবির জন্ম। কবির বালিকাবেলা অতিবাহিত হয়েছে সেই কালে, যেকালে নারী আত্মশ্রীল হতে পেরেছে নবনির্মিত রাষ্ট্রপরিকাঠামোর হাতে। কিন্তু সেই আত্মশ্রয় জল ঢেলেছে রাষ্ট্রনীতি, জল ঢেলেছে প্রচলিত পুরাতনপন্থী পিতৃতন্ত্র। তাই এই আশাহত হওয়ার গহ্বর ততটাই বৃহৎ হয়েছে যত সময় এগিয়েছে। এই ভরসাহীনতাই সাতের নারীকণ্ঠকে পুনরায় জাগরিত করেছে, নতুন লড়াইয়ের ডাক দিয়েছে কৃষ্ণা বসুরা। পূর্ববর্তী দশকের কবিদের সেই আশাহীনতাজাত দ্রোহ দেখা যায় না, যতটা দেখা যায় সাতের নারীকবিদের কবিতায়। ষাটের কবিরা বলেছেন, দ্রোহ করেছেন, নারীর নতুন নতুন বাঁচার রসদকেও কবিতায় প্রতিস্থাপন করেছেন। কিন্তু কোথাও তাঁদের আশাহীন অভিমান প্রকাশ ছিল না। কিন্তু সাতের দশক

সেই দশক যে দশক ভরাসাহীন লড়াইয়ের মুখোমুখি করাচ্ছে নারীকণ্ঠকে। যা শুরু হয়েছিল কবিতা সিংহেরও পূর্বে। কৃষ্ণা বসুরা পুনরায় লড়াইয়ের কথা বললেন, যেন অবরোধের বিরুদ্ধে একটা নতুন শুরু, নতুন সমাধানের পথ খুঁজতে ব্যস্ত কবি—

“এইসব আপাত শান্তি প্রস্তাবনা ভেঙে দিয়ে, একদিন আগ্নেয়গিরির মুখ

খুলে যাবে হাহা করে ছুটে আসবে লাভাস্রোত, অগ্নিময়, সারণী
বিনাশী গান নেচে উঠবে বাতাসে বাতাসে। অগ্নি সম্ভাবনায় সুগভীর
গহ্বর নিয়ে বেঁচে আছি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো রমণী জনম,
নারীর জীবন, একদিন জ্বলে উঠবে ঠিক।”^{১১}

কবিতার নাম ‘সুপ্ত আগ্নেয়গিরির গান’। এই আগ্নেয়গিরির মুখ খুলে যাওয়া আসলে নতুন জাগরণের ইঙ্গিত। কবি আশাহীন সময়ের ওপর পা দিয়ে হেঁটেও আশাবাদী। কারণ তিনি নারীর আপন শক্তিতে ভরসা রাখেন। কবি জানেন একদিন ধ্বংস হবে নারী জন্মের নৃশংস দিকগুলির। কবি জানেন জ্বলে উঠবে একদিন সঙ্কলে সমারোহে। এই ভরসার কথা কৃষ্ণা বসু বারবার উচ্চারণ করেন। এই একই ধারা কবি বয়ে চলেছেন তাঁর ‘ছাপা অক্ষরের যাদু’ কাব্যগ্রন্থে। কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ হচ্ছে যখন, তখন কবি প্রায় চৌষটি। জীবন-অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার পরিপূর্ণ কবি লিখতে পারেন ‘ভালোবাসা পাবো বলে রাত জেগে থাকি’ নামের কবিতা। কবি লিখছেন—

“প্রোষিতভর্তৃকা নারী আমি, আঁচলের প্রান্তে
বেঁধে রাখি প্রেম, কাম, অচরিতার্থ বাসনারা যত,

... ..

রাক্ষসীর মতো মনে হয় নিজেকে আমার,
ভূতগ্রস্থ রমণীর মতো ঘুরি, ফিরি, চলি।”^{১২}

প্রিয়সঙ্গ ব্যতীত নারীর বেদনা এখানে ফুটে উঠলেও নিজেকে ‘রাক্ষসী’র মতো সর্বগ্রাসী করে গড়ে তোলার উপমা আমাদের ভাবায়। রাক্ষসী ও ভূতগ্রস্থ হয়ে ওঠার মধ্যে নারীর যে আগ্রাসন লুকিয়ে আছে তা নারীকণ্ঠের বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের স্মারক। কারণ কবি জানেন—

“জীবনের সকল গ্রন্থি তুমি খুলতে পারবে না।”^{১৩}

খোলা যায়ও না। কবি বলতে পারেন নিজেকে—

“নাগরিক মানবী আমি

ব্যস্ত থাকি, ত্রস্ত থাকি জীবন ব্যাপারে,
তবু রক্তের গভীর চোরাটানে গ্রামখানি
জেগে ওঠে গূঢ় গানে গানো!”^{১৪}

‘নাগরিক মানবী’ হয়ে ওঠা কবির গ্রামখানি জেগে ওঠার ব্যঙ্গনা কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। যে গ্রাম রক্তের গভীরে জেগে ওঠে তা প্রতিরোধ করে কৃত্রিম নাগরিকতাকে। মেকি সম্পর্কের জালে নিমজ্জমান নারীজীবনে নারীর আপন সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার ইঙ্গিত দিলেন কবি। এই নারীর আপন সত্তা নারীকে আত্মমর্যাদাশীল করে তোলে, যা রক্তের গভীরে সুপ্ত, যাকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন কবি। কবির ঘোষণা—

“প্রাণের ভিতরে দোলে ছায়া কালো কালো”^{১৫}

কবি চান নারীমুক্তি, কিন্তু মুক্তির সাথে সাথে বুঝিয়ে দিতে চান নারীর লড়াইয়ের প্রতিটা ছাপকে, নারীর অবদমনের প্রতিটা চিহ্ন ও মাত্রাকে।

চর

কৃষ্ণা বসু বাংলা কবিতায় সহজ সুরে কঠিন প্রতিবাদকে আমদানি করতে পেরেছেন। এই সহজ সুর আসলে তার সহজাত কথন। তাঁর কলম যেমন অভিজাত নারীর যন্ত্রণায় সিক্ত তেমনি রূপজীবিনী মেয়েদের মনভাষ্যের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পেরেছে। তিনি সভ্য সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র প্রশ্নে সোচ্চার হন এবং স্পষ্ট উত্তরও দেন—

“কে গড়েছে ঐ মেয়েকে, ঐ পেশা-কে কে?/ পিতৃতন্ত্র, পুরুষতন্ত্র, পরম্পরা, রে!”^{১৬}

এই শরীরকে ঘিরে বেঁচে থাকা মেয়েদের দিকে বাঁকা চোখে তাকানো সমাজ, সুসভ্যতার মুখোশ পরে আছে দিনের আলোয়। রাতের অন্ধকারে, আড়ালে-আবডালে সেই মুখোশ খুলে পরে নারীমাংসের লোভে। সেই সমাজ সেই সভ্যতা যা পিতৃতন্ত্রের ধারক ও বাহক; আসলে সেই তো টেনে ছিঁড়েছে মায়ের গায়ের তাঁত-শাড়ির সমৃদ্ধি। দেশভাগ ও তৎপরবর্তীকালে উদবাস্তু সহায়হীন মেয়েদের অবস্থান ঝঝাতে স্পষ্ট করে দিয়েছে এই দেশের মতো মায়ের ও মেয়েদের লজ্জা আক্রান্ত টিনে ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার করে দেয় রাষ্ট্র-দ্বন্দ্ব। কবি জানেন তথাকথিত সভ্যতার গর্বে বুক ফুলিয়ে এই সমাজ কোনোদিনই কোনো মেয়েকে যথাযোগ্য সম্মান মর্যাদা দেবেনা। তবু তিনি সচ্চার হন—

“দুহাত তোলো, ক্ষমা তো চাও সুসভ্যতা আজ/ ভিতর এবং বাইরে তোমার দারুণ কারুকার্য!”^{১৭}

বিস্ময়বোধক চিহ্নের ব্যবহারে এই ভিতর ও বাইরের মেয়েদের অবস্থানগত সীমারেখাকে ঘুচিয়ে দিয়েছেন কবি। সমাজে অথবা পরিবারে ঠিক কামে-প্রেমে-ভালোবাসায়-ঘেন্নায়-দয়াদাক্ষিণ্যে ঠিক কোন পর্যায়ের প্রভেদ ‘গৃহের নারী, বাহির নারীর’। ‘প্রভেদ সুনিশ্চিত’। কিন্তু সেই প্রভেদ কী আদৌ নারীর আপন যাপনে কোনো অতিরিক্ত মর্যাদা কিম্বা সুখ যুক্ত করতে পারে? না, পারে না। আর তাই ‘এক অভিজাত নারীর দিনলিপি’তে লেখা হয়—

“আমার ভিতর দিকে অদ্ভুত অসুখ খেলা করে। খাঁকা হয়ে, শূন্য হয়ে, হেলা ফেলা হয়ে পড়ে থাকি সংসার কিনারে।”^{১৮}

‘গৃহ’ নামক বিশ্বের ভিতর এই শূন্যতা এই আত্মহননের পথে ক্রমশ ক্রমশ এগোতে থাকা ফুরিয়ে যাওয়া মেয়েরাই তো ‘শরীর বেচা’ মেয়েদের জন্মদায়িনী। নয় কী? কেও ঘরে কেও বাইরে তফাৎ শুধু পদ্ধতিগত। ‘আমি কেও নই এ বাড়ির’ তবু কী অভিলাষে ‘বোকা সোকা মায়াবতী হয়ে বেঁচে’ থাকা! সেখানে তো কেবল বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানের সস্তা ও সুবিধেযোগ্য পদ্ধতিকে হাতিয়ার করে কোনো এক নির্দিষ্ট পুরুষসিংহের হাতে নারীর জননতন্ত্র ব্যবহারের অনুমোদনপত্র তুলে দেবে সমাজ। আর সেই ছাড়পত্রের সুযোগ্য ব্যবহার করে সেই পুরুষ নারীর জননতন্ত্রকে করে তুলবে পুত্র জন্ম দেওয়ার মেশিন কিম্বা নিজ কামনা চরিতার্থ করার মাংস পিণ্ডে। তারও পরে পুরনো হয়ে যাওয়া গৃহ-নারীর ব্যবহার শেষ হলে সংসারের এক কিনারে উচ্ছিষ্ট খেতে পরতে দেওয়ার সামান্য মূল্য চুকিয়ে দিতে পারলেই বিনিময়ে সেই মায়াবতীরা পুরুষের জন্য জুটিয়ে আনে একবাড়ি ভর্তি সেবা ও আরাম, মায়া ও ভালোবাসা। ‘সোম থেকে মঙ্গল, বুধ বৃহস্পতি, শুক্র, শনি সব এক’, একইভাবে পেরিয়ে যায়; তবু এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে না। এও তো একপ্রকার নিজেকে বেচে দেওয়া সমাজের নিয়মের যুপকাঠে। তাই তো কবি এই সমাজ নির্দিষ্ট উচ্চ ও নিম্ন অবস্থানের দুই নারীকে একই কাব্যগ্রন্থে নিয়ে এসে ‘পরান পুতুলি পদ্য’ লিখতে বসলেন। আবার ‘মেয়েকে মায়ের চিঠি’ কবিতায় ঠিক এর বৈপরীত্যে দাঁড়িয়ে মা শেখাচ্ছেন সেই চিরাচরিত গড়ে তোলার গত, ‘এই আশ্চর্য সম্মোহী সোনার সংসার গড়ে তোলা’র জন্য নিজত্ব ভুলে নিমজ্জিত হতে বলেছেন সংসারের সুক্ষাতিসুক্ষ্ম মায়ার বাঁধনে— ‘ভাঙা তো সহজ খুব। গড়াই কঠিন!’ আজন্ম লালিত এই পাঠ বাঙালি মায়ের নিজস্ব অর্জন, নাকি পিতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামোই তাকে ভুলিয়ে রেখেছে চিরটাকাল মায়ার ছলনায়, সংসার নামক সুমধুর এক ক্রীড়া বস্তুর মোহে? এপ্রশ্ন এসেই পরে যখন দেখি তারই আত্মজা হু হু করা বুক ভালোবাসার অপেক্ষায় থেকে বয়ে যেতে দিয়েছে জীবন-যৌবন, তবু বিয়ের বর্ম গায়ে চাপিয়ে পুরুষের পায়ের নিচে চাপা পড়তে চায়নি। এ সিদ্ধান্ত এই অবিচল আত্মগত উপলব্ধি একান্ত তারই। কারণ না ‘দেখা বরের জন্য’ বিরহ বদেনার মধুর অনুভবে দগ্ধ হতে সে রাজী কিন্তু পুরুষরূপী নিষ্ঠুর অমানবিকতার পরাকাষ্ঠার প্রতাপে দগ্ধ পুড়তে সম্মত নয়, অবশ্য এই অবিচলতা তাকে দিয়েছে অগ্রজদের বলিদান। কবি বললেন—

“...ভুল বিবাহের বাঁশি কীভাবে/ কাঁদাল তার অগ্রজকে হাড়ে ও মজ্জায়!”^{১৯}

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের বদলে যাওয়া ভাবনাকে, সমস্ত স্তরের, সমস্ত অবস্থানের মেয়েদের প্রাণের কথাকেই তো তিনি বারংবার তাঁর কাব্যে চিত্রিত করতে চেয়েছেন, আর এরাই হয়ে উঠেছে তাঁর ‘পরান পুতুলি’। কবিতার শীর্ষ-শিল্প কাব্যগ্রন্থে কবি বললেন—

“প্রতিবাদ ফুটে ওঠে মেয়েদের ঠোঁটে:/ নরম গানের দিন শেষ হয়ে আসে,/ প্রতাপী পুরুষটিকে আজো ভালোবাসে/...ভুলে ভরা ঘর/রক্তের ভিতর গিয়ে বেড়েছে শিকড়!”^{২০}

দিন বদলাচ্ছে এ যেমন সত্য, তেমন কৃষ্ণা ভুলে যাননি সেই বদলের লয় খুব দ্রুত হতে পারে না। তাই নারীবাদী হয়েও তিনি বিক্রপ করেন না তাদের যারা আজও পুরুষের প্রতাপীরপকেই ভালোবাসে। বরং তিনি তাদের চোখে আঙুল রেখে দেখিয়ে দেন এই নুয়ে থাকা, হীন-অবহেলিত হয়ে থাকা, পুরুষ-নির্ভর হয়ে বাঁচা, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে না করার যে চিরায়ত অভ্যাস তা আমাদের মস্তিষ্কে-হাড়ে-মজ্জায় শিকড় ছড়িয়েছে। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার অভাব, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক মেয়েদের মানসিক গঠন ও অসহায়তা, শারীরিকভাবে নারী পুরুষের চেয়ে অনেকাংশে দুর্বল এই মিথ, এমনকি মস্তিষ্কের উর্বরতাতেও নাকি নারীই পিছিয়ে— এই ধরনের মনোভাবই আজও পিতৃতন্ত্র স্বহিমায় বিরাজমান থাকার অন্যতম কারণ। তাই কবি দায়িত্বভার অর্পন করছেন আগামী মেয়ে প্রজন্মের হাতে, নিজ-পরিচয় তৈরি করে আপন বিশ্ব প্রতিষ্ঠার।

কবি কৃষ্ণা বসু বিশ্বাস করেন সেইদিন আসবে যেদিন কন্যাদেরও পৃথিবী ভরে উঠবে স্বাধীনতার আনন্দগানে, মর্যাদা প্রাপ্তির সুর-তালে ও জয়গানে। কন্যারাও মাথা উঁচিয়ে হেঁটে যাবে পিতাদের পাশে পাশে, স্বহিমায় স্বমর্যাদায় স্বপরিচয়ে। তাই তো কবি সেই কন্যাদের অপেক্ষায়। একদিন যেমন দখিচী নিজের জীবন উৎসর্গ করেন মর্ত্য-পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তেমনি কবি নিজের ‘আয়ু রেখা’ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত নতুন বিশ্বে মেয়েদের উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশকে অগ্রগামী করবে যারা তাদের জন্য, নিজ আত্মজের জন্য, সন্তানের জন্য। সময়ের নিয়মে প্রজন্মের রুচি বদলাবে, সন্তান অচেনাও হবে, বদলে যাবে সবই। তবু সেই সন্তানই যেন নির্মাণ করবে, সৃষ্টি করবে, ফুটে উঠবে ফুলময় মানসিক সৌন্দর্যের স্ফেদ্রে, এই বিশ্বাসেই মায়ের উচ্চারণ—

“তবু তুই, তবু তুই, তুই ছাড়া কানা /তুই স্বপ্ন, তুই পুষ্প, তুই শস্য-দানা।”^{২১}

এই মাতৃত্বের যাপন শুধুই মা হয়ে ওঠার গরিমায় সুদীর্ঘ পথ পাড়ী দেওয়া নয়। তারচেয়েও অনেক বেশি। সন্তানকে কাছে পেতে, তাকে এই সমাজের কলুষতার থেকে মুক্ত করে ভবিষ্যতের ‘শস্য-দানা’ রূপী উৎকৃষ্ট সৃষ্টির রূপকার করে তুলতে এই সাহসী মা বদ্ধপরিকর। সে সন্তানের হাতে তুলে দেবে সুস্থ সুন্দর এক বাগানবিলাস যেখান থেকে সন্তান তার নিজস্ব চলনের নিজস্ব বিকাশের নিশ্বাসবায়ু সংগ্রহ করে ভরে উঠবে ফুলে ফলে সৌরভে আর তা ছড়িয়ে দেবে সমাজের সবখানে।

পাঁচ

কবি কৃষ্ণা বসুর কবিতার সবথেকে বড় জোরালো বিষয় তাঁর কবিতার স্পষ্টতা। অত্যন্ত স্পষ্ট সুরে তিনি ব্যক্ত করতে পারেন তাঁর ভাষ্যকে। নারীবাদী দর্শন তখন অনেকটাই স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত যখন তিনি লিখছেন। ফলত, একটা নিখুঁত বিষয়সূচি বা Agenda-কে কেন্দ্র করে কবি লিখেছেন তাঁর কবিতা। তাঁর কাছে স্পষ্ট যে তিনি যে লড়াইটি লড়তে চান তা, স্পষ্ট তাঁর প্রতিপক্ষ। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তাঁর কথার এই স্পষ্টতা সমস্ত শ্রেণীর পাঠককে আকৃষ্ট করে। খুব সহজাত ভাবেই নারীদের আঁতের কথা, সহজাতভাবে নারীর বিরুদ্ধে চলা পত্রিকাগুলি কবি তুলে ধরেন তাঁর কাব্যে। সেখানে কোনো উচ্চমার্গের চিন্তনকে তিনি কবিতায় প্রবৃষ্ট করান না। রাখেন না এমন কোনো কাব্যিক প্রকৌশল যা তাঁর কবিতার ভাষ্যকে মননশীলতার বাইরে বের করে এনে বুদ্ধিদীপ্ত করে তোলে। তিনি গভীরতা চেয়েছেন কবিতায়, কিন্তু উপমার তীর্থক বৈচিত্র্য চাননি। কারণ, যা পাঠকের সাথে ভাষ্যের নৈকট্যকেই তাঁর কবিতার প্রধান রসদ করে তুলতে চেয়েছেন। আর এখানেই পৃথক হয়ে যাচ্ছেন কৃষ্ণা বসু বাকিদের থেকে। বিপুল অঙ্কের পাঠকের কাছে তিনি ছড়িয়ে পড়েছেন তাঁর চিন্তনের গভীর প্রকাশে।

কৃষ্ণা বসুর জীবন কবিতাময়। কবিতা কৃষ্ণা বসুর কাছে আলাদা কোনো শিল্প হয়ে ওঠেনি, হয়ে উঠেছে জীবনালেখ্য। কবিতার মধ্যে দিয়ে কবি নিজের ভাবনার প্রকাশ ঘটান, যে ভাবনা বরাবর ন্যস্ত থেকেছে নারীপ্রগতির নিমিত্তে। ‘জীবনের কৃষিকাজে’ নামক কবিতায় কবি লিখছেন—

“আমার সমস্ত শরীর ভরে রক্ত জুড়ে কবিতার বীজ লেগে আছে।

আমি আচ্ছন্ন আক্রান্ত থাকি কবিতার মায়াবী জাদুতে।”^{২২}

কবিতার চাষ করতে করতে এই আচ্ছন্নতা, এই আক্রান্ত থাকার কারণ কবি দেখান নারীর সেই লাশগুলিকে, যেগুলি সংসার সমুদ্রে কিংবা প্রাচীনপন্থী সমাজ আবেষ্টনে রক্তাক্ত হয়ে আছে। সেই সমস্ত টিকেথাকা নারীর যাপনের কথা কবির ফসল, যা দেখান কবি। এ যেন নিজেকে রক্তাক্ত করে নিজের লোহিত ললাটলিখন। কবি লেখেন—

“রক্তের স্রোতে, রয়েছেন এক বাউল বৈরাগিনী,/ স্বভাবের গূঢ় চোরা টান থেকে আমি তাঁকে ঠিক চিনি!”^{২৩}

কবির এই চেনা নিজেই। এই স্বাভাবিক বাউল সত্তার খোঁজ আসলে কবির নিজের নিজেই খোঁজ। কবি কৃষ্ণা বসুর কবিতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যই এই আত্মবিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ কবিকে বৈরাগী করে তুলেছে।

কবিতা সিংহ ও পরবর্তী নারীকণ্ঠের যে নারীবাদী আখ্যান তা কোনো এক সমমাত্রিক বৌদ্ধিক স্তরে দাঁড়িয়ে লেখা। কিন্তু কৃষ্ণা বসু পৌঁছে গেলেন নারীজগতের প্রতিটা শ্রেণীকক্ষে, বসালেন নিজেকে প্রতিটা ঘরে, সমব্যথী হলেন। লিখলেন পৃথক পৃথক নারীবাদী আখ্যানমালা। তাই জন্য তাঁর কবিতায় লিঙ্গসাম্যতার পাশাপাশি নারীর যৌন স্বাধীনতার কথাও আছে, আবার সেবাদাসী হয়ে ওঠা নারীর বেদনার কথাও আছে। নারীকণ্ঠের এই পৃথকীকরণ জন্যই কৃষ্ণা বসু পৃথক হয়ে ওঠেন অন্যদের থেকে। প্রতিবাদের সাথে কৃষ্ণা বসু খুঁজতে চেয়েছিলেন নারীর নিজস্ব জগৎ, নিজস্ব স্বকীয়তাকে। এই নিজস্ব জগত ও স্বকীয়তা নিজস্ব বাড়ির মত, যেখানে নারী নিজেকে উন্মুক্ত করে বাস করতে পারবে, স্বাধীন চিহ্নে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারবে। দরদ এবং তীব্র সংবেদনশীলতার মিশেলে গড়ে ওঠা তাঁর কবিতা পাঠককে এক দায়বদ্ধতার দ্বীপপ্রান্তে নিয়ে যায়। পাঠক সচেতন হয়, পাঠক প্রতিবাদী হয়, পাঠক অতীতের ভুল কৃতকর্মকে শুধরে নতুন সত্যের পৃথিবী গড়তে সক্ষম হয়। এই শুভাত্মক আশাবোধ নিয়েই যেন কৃষ্ণা বসুর কবিতা লেখা। নিশ্চিতভাবেই কবিতার দ্বারা পঙ্গু সমাজের বুকে ডাক্তারি করে চলেছেন কবি, সংস্কার করে চলেছেন কবিতার দ্বারা রাষ্ট্রের পচা-গলা নর্দমায় ব্যবস্থাপনাকে।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ‘সত্ত্বের রচিত কবিতা : ফিরে দেখা’, কোরক, ‘দুই বাংলার কবি ও কবিতা সংখ্যা’, তাপস ভৌমিক (সম্পাদিত), শারদীয় ২০১৫, পৃ. ৮২
২. বসু, কৃষ্ণা, কবিতা সমগ্র (তৃতীয় খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ২০১৬, পৃ. ১৯
৩. তদেব
৪. তদেব
৫. তদেব, পৃ. ৩৫
৬. তদেব
৭. তদেব, পৃ. ২৪৫
৮. সরকার, কল্যাণ কুমার, নারীবাদ, লিঙ্গ রাজনীতি ও নারীর ক্ষমতায়ন, এভেনেল প্রেস, পূর্ব বর্ধমান, প্রথম প্রকাশ ২৫ শে বৈশাখ ১৪২৫, পৃ. ১২৩
৯. তদেব
১০. বসু, কৃষ্ণা, কবিতা সমগ্র (তৃতীয় খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ২০১৬, পৃ. ২৪৬
১১. তদেব, পৃ. ২৫১
১২. তদেব, পৃ. ২৮৬
১৩. তদেব, পৃ. ২৯১
১৪. তদেব, পৃ. ২৯৩
১৫. তদেব

১৬. তদেব, পৃ. ১০২
১৭. তদেব
১৮. তদেব, পৃ. ১০৭
১৯. তদেব, পৃ. ১৪৭
২০. তদেব, পৃ. ১৫৮
২১. তদেব, পৃ. ১৮০
২২. বসু, কৃষ্ণা, কবিতা সমগ্র (চতুর্থ খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ২০২২, পৃ. ১৬৪
২৩. তদেব, পৃ. ২৮১